সমরেশ চৌধুরী

গৌতম, তোর সাথে আমার কখনো তো আড়ি হয় নি!

'নম্বর না দিলে...' বলেই বিভাগীয় প্রধানের সামনের টেবিলের ওপর একটা জ্যান্ত সাপ ছেড়ে দিল...।

এটা ১৯৬৭ সালের ঘটনা। পার্ট ওয়ান পরীক্ষার টেস্ট-এর খাতা দেখছিলেন অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় নিজের চেম্বারে। আমরা 'থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স'— আমি, সমীর দত্ত আর 'ও' কথা বলতে বলতে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আচমকা-ই 'ও' বা-দিকে ঘুরে প্রধানের ঘরে ঢুকে পড়লো—। একেবারে অভাবনীয়, এই প্ল্যানটা আমরা দু'জন জানতাম-ই না। তারপরই ওই টেবিলের ওপর সাপ। ড: মুখার্জী প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাড়ালেন আর পরমুহূর্তেই সাপটি আবার গৌতমের ঝুলির ভেতরে! আমরা আর দাঁড়াই নি। পরে 'স্যার' অন্যদের কাছে উচ্চহাস্যে (অবশ্যই আমাদের দিকে চোখ পাকিয়ে) এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন। অসম্ভব ভালোবাসতেন আমাদের, আর ঐটুকু পাওনা হয়েছিল গৌতমের সৌজন্যেই।

১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলজি (শারীরবৃত্ত) বিভাগের হিস্টোলজি ক্লাসরুমে গৌতমের প্রথম আবির্ভাবেই ও সাড়া ফেলে দিয়েছিল — একটা ফাটা-তালিমারা জিন্‌স আর ততোধিক কোঁচকানো (ভালো ভাষায় অবিন্যস্ত) হাফ শার্ট, চাউনিতে একটা ক্যাবলা ভাব, সঙ্গে বোকা-হাসি (সবটাই ওর পূর্ব-পরিকল্পিত বদমায়েশি)। মেয়ে সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই নিজেকে এলেমদার মনে করত এবং করুণা বর্ষণের চেষ্টা করছিলো। কিন্তু, শুধু ক্লাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা! তারপরই ও 'হাউ মেনি রাইস্ ফ্রম হাউ মাচ প্যাডি' বুঝিয়ে ছেড়েছিল সব্বাইকে। মাত্র এক সপ্তাহেই 'ও' সকলের মধ্যমণি হয়ে উঠল। মজা করা এবং দমফাটা হাসির পরিবেশ তৈরি করার এত আধুনিক ও মৌলিক উপাদান ওর ভান্ডারে অফুরান ছিল, ভাবতেও অবাক লাগে।

আমাদের বসার জায়গা ক্লাসে নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। আর অচিরেই আমি, গৌতম ও সমীর 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' নামে কলেজে বিখ্যাত হয়ে গেলাম। মজা আর হৈ হৈ একটা দিক — কিন্তু আর একটা সংবেদনশীল জায়গা একলীন হয়ে যাওয়ায় আমাদের টেম্পারমেন্টটা একটা পরিপূরক জায়গা খুঁজে পেল — গান। আমরা প্রচন্ড ভাল বন্ধু হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে

'গান ভালোলাগা' আর একটু-আধটু গাওয়া দেখেই ও আমাকে একদম নিজের মত ভেবে নিয়েছিল। খুব কাছ থেকে ওর 'মিউজিকাল কনসেপ্ট' অনুসরণ করতে পেরেছিলাম বলেই আজ অবলীলায় বলতে পারি যে গৌতমের প্রতিভা বুঝতে ওর এই সময়টার সঙ্গ আমাকে একটা নির্দিষ্ট ধারণা দিয়েছিলো। একটা তীব্র 'মিউজিকাল সেন্টিমেন্ট' কাজ করত সেই বয়সেই যেটা নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে কারও সাথে 'কম্প্রোমাইজ' করেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে তার অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে একটি যোগ্য পদ ছেড়ে বেরিয়ে আসা। — শুধুমাত্র সঙ্গীত বিষয়ক মতানৈক্যই বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে। ছাত্রাবস্থায় কফি-হাউসে যেমন আমাদের বহুমুখী আলোচনায় সময় কেটেছে, তেমনই অনেক সময় গভীরতর আলোচনায় দিনান্তে আমরা দুজন হেঁটে গেছি কলেজ স্ট্রিট থেকে শিবপুর (আমার তৎকালীন বাড়ি), কখনও ভিক্টোরিয়া, আবার খিদিরপুর হয়ে বেহালা— সেই বেহালা পঞ্চাননতলার বাড়ি, যেখানে প্রায়ই চাঁদের হাট বসতো। শঙ্করদা (শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়), শিবাজীদা, মানিক (গৌতম), বুলা, বিশু, রঞ্জন, আমি, সোনালী, শান্তাদি ছাড়াও মাসীমা-মেসোমশাইকেও সামিল হতে দেখা যেত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং গানের ঝুলি নিয়ে। অনেকদিনই বাড়ি ফেরা হত না— সারারাত গল্প হত ছাদে বসে। এই ঘনিষ্ট সময়গুলোই সুযোগ করে দিয়েছিলো একটা উদার-প্রশস্ত হৃদয়, একটা অসম্ভব অভিমানী, ক্ষেত্রবিশেষে এক অতি সিরিয়াস গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বুঝে নিতে।

পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পর আমরা ক্লাস থেকে সদলে দার্জিলিং গিয়েছিলাম — সেটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা! আমাদেরই এক সহপাঠীর (স্মিতা) বাবা আমাদের নিখরচায় বি.টি.হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় খুব সুলভ-দার্জিলিং ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল। ট্রেনেই শেয়ার করে খাওয়া আর ছ্যাবলামিতে সময় কাটার ফাঁকে একসময় আত্মস্থ গৌতমকে খুঁজে পাওয়া গেল — তার গিটারে (অবশ্যই স্প্যানিশ) যখন সে গভীরতায় ডুবে 'দেশ' রাগ বাজাচ্ছে। ছাত্রাবস্থায় আমরা বেশ অর্থকষ্টে — সীমিত অর্থের যোগান হাতে অতএব ভাল রেস্তোরাতে বসে খাওয়ার জন্য অন্য ভেক ধরলো গৌতম। মনে আছে 'কেভেন্টার্স' এবং 'গ্লেনারীস'-এ উদম গান-বাজনায় জুটে গিয়েছিল আমাদের 'কমপ্লিমেন্টারি' ডিনার। এমনকি ম্যালের কেন্দ্রে দাড়িয়ে আমাদের গান-বাজনা প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করত। মজা করে টুপিতে কিছু পয়সাও উপার্জন করেছিল গৌতম। আমার মনে হয়, আজকের প্রজন্মত এই তীব্র আধুনিক এবং সাহসিক কৌতুককর্মকে বাহবা দেবে। মনে রাখতে হবে সেটা ১৯৬৭ সালের কথা — আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর আগে। অচিরেই আমাদের অনেক স্থানীয় নেপালী বন্ধু হয়ে গেল। সেই শুরু, পরবর্তী জীবনে বহু নেপালী বন্ধু আমাদের হয়েছিল — এমনকি 'রক্ ক্লাইম্বিং'-এর সময় শেরপা প্রশিক্ষকরাও। এসবেরই পুরোধা কিন্তু গৌতম। এই ক'দিনেই আমরা দার্জিলিং-এ 'হৈ চৈ পার্টি' হিসাবে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম (যেমন, আলফ্রেড— এক অস্ট্রেলিয় পর্যটক, বিশ্বনাথদা — 'হ্যাপি ভ্যালি'র মালিক পর্যায়ের একজন)। যাদের বদান্যতায় আমাদের বেশ পুষ্টি বৃদ্ধি ঘটেছিলো।

গৌতমের নির্দেশনায় এই কলেজ জীবনেই 'বৃহন্নলা-সংগীত' অত্যন্ত জনপ্রিয় (একটা গোষ্ঠীর কাছে) হয়ে উঠেছিলো (যেমন, 'মনের মতো কুসুম পেলে বাসর সাজাবো' ... 'কইগো যশোদামনি, কোথায় তোমার নীলিমণি...' ইত্যাদি)। এজন্য আমরা শাড়ি-লিপস্টিক-ও ব্যবহার করেছি — কোথাও কোথাও আমন্ত্রিত অভিনয়ের চাপে! ছাত্র আন্দোলনের (নক্‌শাল আন্দোলন) জন্য বেশ কিছুদিন 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' বন্ধ ছিল। এই সময়টা আমরা নিউ আলিপুরে অধ্যাপক অচিন্ত্য মুখার্জীর বাড়ি গিয়ে ক্লাস করতাম। উৎকণ্ঠার পারদ বেশ চড়তে থাকতো যতক্ষণ না পর্যন্ত বেশ ভারি একটা খাবারের প্লেট হাজির হতো টেবিলে। আর অন্যমনস্কতার সুযোগে বিশেষত মেয়েদের প্লেট ফাঁকা হয়ে যেত। এরই থেকে জন্ম নিয়েছিল আমাদের বিখ্যাত 'দিগ্বিজয় অভিযান' — এক-একদিন একেকজনের বাড়ি গিয়ে 'ভাল আছেন তো' সম্ভাষণে উদর-পূর্তি!

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপারে আমরা কয়েকজন একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম — আসলে পড়াশুনাটা নিয়ে খুব মাথাব্যথা ছিল না। প্রেসিডেন্সির মাঠে আমাদের গানের আসর বসত! গৌতম, আমি, দীপেশ (চক্রবর্তী, এখন আমেরিকায় ইতিহাসের অধ্যাপক), রামপ্রসাদ (অঙ্ক, পরে ইঞ্জিনিয়ার), দীপক, সৌরিশ আরও অনেকে। নক্‌শাল আন্দোলনের ঢেউও এসে আমাদের নাড়া দিয়েছিল। অতএব পড়াশুনাটা ক্ষয় পেতে পেতে একটা ক্ষীণ অবয়ব পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের বহুমুখী উদ্দামতা কমলো না। বিদ্যুৎদা'র কাছে গৌতমের গিটার শেখার গভীরতা বাড়তে থাকলো, গৌতমের গিটার ওর হাতে কথা বলতে থাকলো। এই সময়টা থেকেই ওর মৌলিক ও সৃজনশীল দিকটা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ইতস্তত কিছু গান লেখা শুরু হল। পাড়াতেও (বেহালা) বেশ কিছু গুণী ছেলের (এব্রাহাম) আনাগোনা একটা নির্দিষ্ট 'দল' তৈরির আভাস দিতে থাকলো। কোনোরকমে পার্ট টু পরীক্ষা শেষ হল, আমরা পাশও করে গেলাম।

এর পরের ঘটনা সাময়িক বিচ্ছিন্নতার, তাও অন্যবিধ চাপে। আমি মাস্টার্স পড়ে গবেষণার অধ্যাপনায় গেলাম। গৌতম তার সৃষ্টির আনন্দে ডুবলো, আর ক্রমে 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র জন্ম। এর জন্যে ও দিনরাত পরিশ্রম করতো। আমি মাঝে মাঝে যেতে পারতাম। এ নিয়ে ওর নীরব অভিমানের শেষ ছিল না। এই সময়টা ওর 'সিরিয়াসনেস' দেখার মতো, দল পরিচালনার ক্ষমতা আশ্চর্যজনক। একটা 'ব্যান্ড' তৈরির পরিকল্পনা তখন তার মাথায় একদম পাকা। 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র মহীন সত্যিই আজকের মতো 'বাংলা ব্যান্ড' চেয়েছিলো কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আজকের বাংলা ব্যান্ডের পথিকৃৎ গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তার গান লেখার ধরণ এবং তার পরিবেশনার স্টাইল আজও সব ব্যান্ডেরই অনুকরণীয়। বহু সংগীত সূত্রের আধার যে 'আন্তর্জাতিক' এ নিয়ে তার নিরন্তর এক গবেষণা সততই বহমান ছিল। এই অনুসন্ধানের খাতিরেই তাকে দেশ-দেশান্তরে দৌড়তে হয়েছে। এখানেও তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তার বিশদ আলোচনার জায়গা এখানে নেই।

মৌলিক সুরসৃষ্টি ছাড়াও, গৌতম চিত্রনির্মান নিয়েও বিস্তর ভেবেছে এবং করেছে। যদিও তার মূল লক্ষ্য ছিল কিছু মৌলিক তথ্যভিত্তিক চিত্রনির্মাণ (ডক্যুমেন্টারি), সেখান থেকে তার

উত্তরণ দেখা যায় 'লৌকিক গান'-এর ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ চিত্রনির্মাণে (নাগমতী) যা তাকে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল। এছাড়াও 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মতো সৃষ্টিও তাকে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার লোকগানে। আউল-বাউলেরা তার অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল — যার ফলশ্রুতি, 'বাউল-জ্যাজ্'। গৌতমের বহুল সৃষ্টিকাণ্ডের ব্যস্ততা আর আমারও কর্মজীবনের ব্যস্ততা (দেশে এবং বিদেশে) কখনোই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বকে আলাদা করে ফেলেনি। দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে দেখা হলেও 'পুরানো সেই দিনের কথা' আমরা গভীরভাবে আলোচনা করেছি, মজা করেছি, সবাইকে সাথে নিয়ে উপভোগও করেছি। আমার ও স্বপ্নার বিয়ের বাসরে সারা রাত ও মাতিয়ে রেখেছিল মুখে মুখে তৈরি গান বেঁধে — শাশুড়ি ও শ্বশুরমশাই (চক্ষু চিকিৎসক)কে নিয়ে তৈরি গানে ('চোখ খুঁচিয়ে পয়সা কামায়'...) বাউল-সুর লাগিয়ে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। এ ভোলা যায় না — ও কাউকে ভুলতেও দেয় না। অনেক উল্লেখযোগ্য জিনিসই ও আমাকে জানাতে ভুলতো না — খালি একটা জিনিসই আমাকে জানালো না, কেন 'ও হঠাৎ চলে গেলো?' আমার সঙ্গে ওর কখনও তো 'আড়ি' হয় নি!

*** গৌতম-জায়া 'পুঁটু'-কে উৎসর্গ করলাম।*